Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-XI, Special Issue, June 2023, Page No.115-118
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

শ্রী অরবিন্দের মতাদর্শে ভক্তিযোগ

সুচন্দ্রা নন্দী
রাজ্য সাহায্যপ্রাপ্ত কলেজ শিক্ষক, দর্শনবিভাগ, পাঁচমুড়া মহাবিদ্যালয়, বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:
Arbinder motadarse bhaktijog refers to the path of devotion in the context of spiritual practices. It emphasizes a devotional approach to connecting with a higher power or divine entity. Bhakti yoga involves cultivating a deep, loving devotion and surrender to the divine, often through prayer, worship, and other devotional activities.
Keywords: Motadarsa, Bhaktijog, Spiritual, Devotion, Worship, Devine.

শ্রী অরবিন্দের মতে "সমগ্র জীবনই যোগ"। তাঁর যোগসমন্বয় গ্রন্থে এবং গীভাতে ভক্তিযোগ সম্পর্কে তাঁর মতামতকে তুলে ধরা হয়েছে।

ভগবানের জন্য জীবের হৃদয়ের আকৃতি যেমন ব্যাপ্ত - ভক্তি নিজের মধ্যে তেমনই ব্যাপ্ত এবং প্রেম ও কামনা যেমন সোজা গমন করে তাদের লক্ষ্যের দিকে, ভক্তিতেও ভেমন সরল ও ঋজুমুখী। এইজন্য একে কোন বিধিসম্মত পদ্ধতির মধ্যে নিবদ্ধ করা চলে না, রাজযোগের মত কোন মনস্তাত্বিক বিদ্যার উপর অথবা হঠযোগের মত কোন মনোভৌতিক বিদ্যার উপর এর প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়, অথবা অথবা জ্ঞানযোগের সাধারন পদ্ধতির মত কোন নির্দিষ্ট বুদ্ধিগত প্রণালী থেকেও এর শুরু সম্ভব নয়। এ প্রযোগ করতে পারে নানাবিধ উপায় বা অবলম্বন, আর মানবের মাঝে শৃঙ্খলা, প্রণালী ও বিধানের প্রবণতা থাকায় মানব এইসব সহায়কের আশ্রয় গ্রহণকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করার প্রয়াস করতে পারে।

প্রশ্ন হল কিভাবে ভক্তিমার্গ প্রবেশ করে সমন্বয়ী ও পূর্ণ যোগের মধ্যে, এর কি স্থান সেখানে, এবং এর ভয়ের কিরকম প্রভাব দিব্য জীবনধারনের অন্যান্য তঘের উপর।

সকল যোগের অর্থ হল, যে মানবমন ও মানব অন্তঃপুরুষ এখনো উপলব্ধিতে দিব্য নয়, তবে তার দিব্য সংবেগ ও আকর্ষণ অনুভব করে তার মোড় ঘোরা সেই বিষয়ের দিকে যার দ্বারা সে পায় তার মহত্তর সত্তা। ভাবাবেগের দিক থেকে নিশ্চয় করে বলা যায় যে এই গতি প্রথম যে রূপ নেয় তা আরাধনার রূপ। সাধারণ ধর্মে এই আরাধনা বাহ্য পূজার রূপ নেয়। আর তা থেকে গড়ে ওঠে বিধিসম্মত আনুষ্ঠানিক পূজার এক অতীব বাহ্য আকার। এই উপাদান সাধারনতঃ প্রয়োজনীয় এইজন্য যে বেশীরভাগ লোকই বাস করে তাদের স্থূল মনে, স্থূল প্রতীকের সাহায্য বিনা কিছু উপলব্ধি করতে অক্ষম, এবং স্থূল ক্রিয়ার শক্তির সাহায্য ছাড়া তারা যে কিছু অনুভব করছে তা বুঝতে অক্ষম। সাধনার পর্যায় সম্বন্ধে যে তান্ত্রিক ভাবনায় 'পশু'-র মুখের পাশবিক বা অন্নময় সত্তার পথই তার সাধন পন্থার সর্বনিম্ন পর্যায় সেই অনুযায়ী আমরা বলতে পারি

যে নিছক অথবা প্রধানতঃ আনুষ্ঠানিক আরাধনাই এই মার্গের নিম্নতম অংশের প্রথম ধাপ। এটা স্পষ্ট যে এমনকি আসল ধর্মও – আর যোগ তো ধর্মের অতিরিক্ত কিছু -- আন্তর হয় কেবল তখনই যখন এই সম্পূর্ণ বাহ্য পূজার পিছনে এমনকিছু থাকে যা মনের মধ্যে বাস্তবিকই অনুভব করা হয় -- কিছু অকৃত্রিম প্রপত্তি, ভয় মিশ্রিত সম্ভ্রম অথবা আধ্যাত্মিক আস্পৃহা, আর বাহ্য পূজা তখন এর এক সহায়, এক বহিঃপ্রকাশ, যেন এমন কিছু যা মাঝে মাঝে অথবা সততই এর কথা স্মরণ করিয়ে সাধারণ জীবনের নিবিষ্টতা থেকে মনকে এর দিকে ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করে। কিন্তু যতদিন এ থাকে আমাদের শ্রদ্ধা বা পূজার পাত্র, পরম দেবতার ভাবনা মাত্র, ততদিন আমরা যোগের গোড়াতেও পৌঁছায়নি। যেহেতু যোগের লক্ষ্য মিলন, সেহেতু এর আরম্ভও সর্বদা হওয়া চাই ভগবানের জন্য এষণা, কোনপ্রকার স্পর্শের, সামীপ্যের বা লাভের জন্য আকাঙ্ক্ষা। আমাদের মধ্যে এরকম ভাব এলে, আরাধনা সর্বদাই হয়ে ওঠে প্রধানতঃ আন্তর পূজা; আমরা শুরু করি নিজেদের তৈরী করতে ভগবানের মন্দির রূপে, আমাদের সব ভাবনা ও বেদনাকে আস্পৃহা ও এষণার সতত প্রার্থনায়, আমাদের সমস্ত জীবনকে এক বাহ্য সেবা ও পূজায়। এই পরিবর্তন, এই নতুন আত্মিক প্রবণতা যেমন বৃদ্ধি পায়, ভক্তের ধর্মও তেমন হয়ে ওঠে এক যোগ, এক বর্ধিষ্ণু সংযোগ ও মিলন। অবশ্য এইজন্য যে বাহ্য পূজাকে বাদ দিতেই হবে তা নয়, তবে এ উত্তরোত্তর হয়ে উঠবে আন্তর ভক্তি ও আরাধনার স্থূল প্রকাশ অথবা বহিঃপ্রবাহ, অন্তঃ পুরষের তরঙ্গ নিজেকে বাইরে প্রকট করবে কথায় ও সাঙ্কেতিক ক্রিয়ায়।

আরাধনা যে গভীরতর ভক্তিযোগের এক অঙ্গে পরিণত হবে, প্রেমপুষ্পের পাপড়িরূপে যে ভার অর্ঘ্য ও আত্ম-উন্নয়ন নিবেদন করবে সূর্যের দিকে - তার পূর্বে যা দরকার তা হল এ গভীর হলে তার সঙ্গে আনা চাই আরাধনার পাত্র ভগবানের নিকট উত্তরোত্তর উৎসর্গ। আর এই উৎসর্গের এক অঙ্গ হওয়া চাই আত্মশুদ্ধি, যাতে যোগ্য হওয়া চাই দিব্য সংযোগের জন্য, অথবা আমাদের আন্তর সত্তার মন্দিরে ভগবানের প্রবেশের জন্য, অথবা হৃদয়তীর্থে তার আত্মপ্রকাশের জন্য। এই শুদ্ধি নৈতিক প্রকারের হতে পারে, কিন্তু উচিত ও নির্দোষ কাজের জন্য নীতিনিষ্ঠের যে প্রয়াস এ শুধু তা হবে না, অথবা এমনকি যখন আমরা যোগের অবস্থায় পৌঁছই তখনো এ নিয়মনিষ্ঠ ধর্মে প্রকাশিত ভগবৎ-বিধানের প্রতি আনুগত্যও হবে না; পরক্ত এ এমনকিছু হবে যার অর্থ যা সব ভগবানের স্বরূপ সম্বন্ধে অথবা আমাদের অন্তঃস্থ ভগবান সম্বন্ধে ভাবনার বিরোধী সেই সব কিছুরই অপনয়ন। প্রথমটির বেলায় এ অনুভব ও বহিঃকর্মের অভ্যাসে হয়ে ওঠে ভগবানের এক অনুকরণ, আর শেষেরটির বেলায় এ হয় আমাদের প্রকৃতিতে তাঁর সাদৃশ্যে উপচয়। আনুষ্ঠানিক পূজার সঙ্গে আন্তর আরাধনার যে সম্বন্ধ, বাহ্য নৈতিক জীবনের সঙ্গে ভগবৎ-সাদৃশ্যে উপচয়েরও সেই সম্বন্ধ। এর পরিণতি হল ভগবানের সঙ্গে সাদৃশ্যলাভের দ্বারা একপ্রকার মুক্তি, আমাদের অপরা প্রকৃতি থেকে মুক্তি এবং দিব্য প্রকৃতিতে রূপান্তর।

উৎসর্গ পূর্ণ হলে তা হয়ে ওঠে ভগবানের প্রতি আমাদের সকল সত্তার এবং সেজন্য আমাদের সকল ভাবনা ও কর্মেরও নিয়োগ। এখানে যোগ তার মধ্যে নেয় কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগের সার উপাদানগুলি, তবে তা নেয় তার আপন ধারায় ও তার আপন বিশেষভাবে। এ হল ভগবানের নিকট জীবন ও কর্মের যজ্ঞ, ভবে দিব্য সঙ্কল্পের দিকে নিজের সঙ্কল্পকে ফেরানোর চেয়ে বরং এ আরো বেশী হয় প্রেমের যজ্ঞ। ভগবানের কাছে ভক্ত নিবেদন করে তার জীবন ও সে যা কিছু সে সব এবং ভার যা কিছু আছে সে সব এবং সে যা সব করে সে সবও। এই সমর্পণ বৈরাগ্যের আকার নিতে পারে; এ এইরকম হয় যখন ভক্ত মানুষের সাধারণ জীবন ত্যাগ করে সমস্ত দিন ব্যাপৃত থাকে শুধু প্রার্থনা ও স্তুতি ও পূজায়, অথবা আনন্দ- বিভোর ধ্যানে,

ব্যক্তিগত সকল সম্পত্তি পরিত্যাগ করে সাধু বা ভিক্ষু হয় যার একমাত্র সম্পত্তি হল ভগবান, জীবনের সকল কর্মই পরিহার করে, করে শুধু সেইসব কাজ যেগুলি ভগবানের সঙ্গে মিলনের এবং অন্যান্য ভক্তের সঙ্গে সম্মিলনের সহায় অথবা অন্তর্গত, আর না হয় বৈরাগ্যজীবনের সুরক্ষিত দূর্গ থেকে বড়জোর জনসেবার সেই কার্যগুলি করে যায় যেগুলি মনে হয় প্রেম, করুণা ও মঙ্গলের দিব্য প্রকৃতির বিশিষ্ট বহিঃপ্রবাহ। কিন্তু আরো ব্যাপ্ত আত্মোৎসর্গও আছে যা সকল সর্বাঙ্গীন যোগের সঠিক বিষয়; এতে জীবনের পূর্ণতা ও সমগ্র জগৎকে স্বীকার করা হয় ভগবানের লীলারূপে এবং সেজন্য সমগ্র সত্তা নিবেদিত হয় তাঁর অধিকারে; নিজে যা সে সব এবং নিজের যা আছে সে সব এতে ধারণ করা হয় শুধুই ভগবানের সম্পত্তি বলে, আমাদের নিজেদের সম্পত্তি বলে নয়, এবং সকল এই দুই জীবনেরই সম্পূর্ণ ও কর্ম করা হয় তাঁর কাছে অর্ঘ্যরূপে। এর দ্বারা আসে আন্তর ও বাহ্য সক্রিয় আত্মোৎসর্গ, অখন্ড আত্মদান।

তাছাড়া আছে ভগবানের প্রতি সব ভাবনারও উৎসর্গ। এর প্রারম্ভে এ হল আরাধনার বস্তুর উপর মন নিবদ্ধ করার প্রয়াস কারণ স্বভাবতঃই মানুষের চঞ্চল মন অন্য সব বস্তু নিয়েই ব্যস্ত থাকে, আর এমনকি উপরের দিকে পাঠানোর সময়ও সর্বদাই বিক্ষিপ্ত হয় সংসারের টানে -- যাতে পরিশেষে তার অভ্যাসই হয় তাঁকে ভাবা, আর অন্য সব কিছু তখন শুধু গৌণ এবং ভাবা হয় কেবল তাঁর সঙ্গে সম্পর্কে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এটি করা হয় স্থূল মূর্তির সাহায্যে, অথবা আরও অন্তরঙ্গ ও লক্ষণীয়ভাবে কোন মন্ত্র বা ভগবানের নামের সাহায্যে যার মাধ্যমে ভাগবত সত্তার উপলব্ধি আসে। ব্যবস্থাপকরা মনে করে যে মনের ভক্তির দ্বারা ভগবৎ- অন্বেষণের তিনটি পর্যায় : প্রথম হল ভগবানের নাম, বিভিন্ন গুণ ও এদের সঙ্গে যুক্ত সব কিছুরই নিরন্তর শ্রবণ, দ্বিতীয় হল এদের বা ভাগবত সত্তা বা ভগবানের ব্যক্তিসত্ব সম এই ভক্তি শুধুই হৃদয়ের কামনামাত্র নয়, এ হচ্ছে সমগ্র জীবনের সমর্পণ। এইরূপে যে ভজনা করে, নিজের সমস্ত কর্মকে এক পরম আত্মোৎসর্গে অনন্তের নিকট সমর্পণ করে তার পক্ষে ভগবানই সব, এবং সবই ভগবান। সে ভগবানকে এই জগতের পিতা বলে জানে, যিনি তাঁর সন্তানগণকে পোষণ করছেন, পালন করছেন, রক্ষা করছেন। সে ভগবানকে জগন্মাতা বলে জানে, যিনি আমাদেরকে তাঁর বুকের মধ্যে ধরে রেখেছেন, আমাদের উপর তাঁর প্রেমের মাধুরী অবিরতধারে বর্ষণ করছেন এবং বিশ্বজগৎ তাঁর দিব্য সৌন্দর্যের মূর্তিতে ভরিয়ে দিচ্ছেন। সে ভগবানকে এই জগতের আদি, প্রথম সৃষ্টিকর্তা, সিতামহ বলে জানে; দেশ, কাল ও সম্বন্ধের মধ্যে উৎপাদন ও সৃষ্টি করতে যারা ব্রতী রয়েছে তারা সকলেই তা হতে উদ্ভূত। সে ভগবানকে সকল বিশ্বগত ও প্রত্যেক ব্যক্তিগত বিধানের ঈশ্বর ও বিধাতা বলে জানে। যে মানুষ নিজেকে অনন্তের নিকট সমর্পণ করেছে, জগৎ বা নিয়তি বা অনিশ্চয় সম্ভাবনা কোন কিছুই তাকে আর আতঙ্কিত করতে পারে না; দুঃখ ও অশুভ দেখে সে আর বিভ্রান্ত হয় না। যার দৃষ্টি আছে তার পক্ষে ভগবানই পথ এবং ভগবানই গতি, গন্তব্যস্থলে, সে পথে নিজেকে হারাবার কোন সম্ভবনা নেই; সেই গন্তব্যের দিকে তার সন্ধি - পরিচালিত পদক্ষেপ প্রতি মুহূর্তে তাকে নিশ্চিতভাবেই নিয়ে যায়। সে জানে ভগবান তার এবং সকলের প্রভু, তার প্রকৃতির আধার, প্রাকৃত জীবের পতি, প্রণয়ী ভর্তা, তার সকল চিন্তা ও কর্মের অন্তর্যামী সাক্ষী। ভগবানই তার আবাস, তার গৃহ ও স্বদেশ, তার আশা আকাঙ্খার আশ্রয়স্থল, সকল জীবের জ্ঞানী অন্তরঙ্গ হিতৈষী বন্ধু।

উচ্চতম জ্ঞান ও ভক্তি ব্যতীত, যিনি এই সব, সেই পরম পুরুষের নিকট পূর্ণ আত্মদান ও সমর্পণ ব্যতীত আর কিছুই আমাদেরকে সেই পরম পুরুষের নিকট নিয়ে আসতে পারবে না। অন্য ধর্ম, অন্য উপাসনা, অন্য জ্ঞান, অন্য সাধনা সকল সময়েই যথাযথ ফল প্রদান করে, কিন্তু এ-সব ফল ক্ষণস্থায়ী, ভগবানের প্রতীক ও আভাসের উপভোগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আমাদের মানসিক অবস্থানুযায়ী সকল

সময়েই আমাদের সম্মুখে দুটি পথ খোলা আছে, বাহ্যিক জ্ঞান বা অন্তরতম জ্ঞান, বাহ্যিক সাধনা বা নিগূঢ় অন্তরতম সাধনা। বাহ্যিক ধর্ম হচ্ছে বাইরের কোন দেবতাকে ভজনা করা এবং বাহ্যিক কোনও সুখময় অবস্থা প্রার্থনা করা; এই পথের সাধকেরা তাদের চরিত্রকে নির্মল পাপশূণ্য করে, এবং শাস্ত্রের বাহ্য বিধান পালন করার জন্য নৈতিক ধর্মানুযায়ী কর্ম করে; তারা প্রতীক-স্বরূপ বাহ্যিক যোগের অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন করে। কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে পার্থিব জীবনের অনিত্য নশ্বর সুখ দুঃখের অন্তে স্বর্গলোকের আনন্দলাভ করা, সে সুখ পৃথিবীর সুখের চেয়ে মহত্তর কিন্তু তথাপি তা ব্যক্তিগত ও লৌকিক ভোগ, যদিও সে লোক এই ক্ষুদ্র দুঃখময় পৃথিবীর অপেক্ষা বড়। আর এই যে ভোগ তারা কামনা করে, শ্রদ্ধা ও সদাচারের দ্বারা তারা তা প্রাপ্ত হয়, কারণ কেবল এই জড়জীবন এবং এই পার্থিব সংসারলীলাই আমাদের বক্তিগত সম্ভবনার চরম নয় বা বিশ্বজগতের সমগ্র ধারা নয়। অন্যান্য লোক ও জগৎও আছে এবং সে-সব পৃথিবী থেকে আরও বিশালতর সুখের ক্ষেত্র, স্বর্গলোকং বিশালম্। পরলোকে এই দৃঢ় বিশ্বাস এবং এক দিব্যতর লোকে গমনের আকাঙ্ক্ষা জীবকে এমন শক্তি দেয় যার দ্বারা সে মৃত্যুর পর তার শ্রদ্ধা ও আকাঙ্ক্ষার একান্ত লক্ষ্য-স্বরূপ স্বর্গের ভোগ লাভ করতে পারে; কিন্তু আবার এই মর্ত্য জীবনেই তাকে ফিরে আসতে হয়, কারণ এই জীবনের যে সভ্যলক্ষ্য, সেইটির সন্ধান বা সিদ্ধি সে লাভ করতে পারেনি। অন্য কোথাও নয়, এইখানেই সর্বোত্তম ভগবানকে লাভ করতে হবে, অপূর্ণ জড় মানবীয় প্রকৃতি হতে জীবের দিব্য প্রকৃতির বিকাশ করতে হবে, এবং ভগবাল ও মানব ও বিশ্বের সহিত ঐক্যের ভিতর দিয়ে জীবনের সমগ্র বিশাল সত্যকে জানতে হবে, সেই সত্য অনুসারে জীবনকে গড়ে তুলতে হবে, যেন জীবনের মাঝেই তার অত্যাশ্চর্য প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়। এইভাবেই আমাদের দীর্ঘ পুনরাবর্তন-চক্রের পরিসমাপ্তি হবে এবং আমরা এক পরম সিদ্ধির অধিকারী হব; মানবজন্মে জীবকে এই সুযোগই দেওয়া হয়েছে এবং যতক্ষণ না এটা সম্পন্ন হচ্ছে ভভক্ষণ জন্ম জন্মান্তরের শেষ কিছুতেই হতে পারে না। বিশ্বজগতে আমাদের জন্মের এই যে চরম প্রয়োজন, তার সিদ্ধির জন্য ভগবদ্ভক্ত ব্যক্তি একান্ত প্রেম ও ভক্তির ভিতর দিয়ে সর্বদা সেই উদ্দেশ্যের দিকে অগ্রসর হয়, সেই ভক্তির দ্বারা পরম বিশ্বপুরুষকেই সে তার জীবনের সমগ্র লক্ষ্য করে, - এই পৃথিবীর ক্ষুদ্র অহং-এর ভোগ বা স্বর্গভোগকে নয়; পরম বিশ্বপুরুষকেই সে তার সমস্ত চিন্তা, সমস্ত জ্ঞানের সমগ্র লক্ষ্য করে। ভগবান ব্যতীত আর কিছুই না দেখা, প্রতি মুহূর্তে তাঁর সহিত যুক্ত হয়ে থাকা, সকল জীবের মধ্যে তাঁকে ভালবাসা এবং সকল বস্তুতে তাঁর আনন্দ গ্রহণ করা, -- এটাই হয় তার অধ্যাত্মজীবনের সমগ্র স্বরূপ। তার ভগবদ্-দর্শন তাকে জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে না, অথবা জীবনের পূর্ণতার বিন্দুমাত্র থেকেও সে বঞ্চিত হয় না; কারণ ভগবান আপনা হতেই তাকে সকল কল্যাণ, সকল যোগক্ষেম এনে দেন, যোগক্ষেমং বহাম্যহম্। সে পায় স্বর্গের সুখ বা পৃথিবীর সুখ তার সামান্য ছায়ামাত্র, কারণ সে যেমন ভাগবতভাবে গড়ে ওঠে, তেমনই ভগবানও তাঁর অন্তর্জীবনের অজস্র জ্ঞান, শক্তি, আনন্দ, নিয়ে তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হন।